সূচিপত্র

কেন এ বই?	৯
দিনবদলের স্বপ্ন	১৫
ঋণের বোঝায় জর্জরিত	১৯
অগ্রপথিক	২৬
গৎবাঁধা চিন্তার হোক অবসান	৩২
কেন আমরা ব্যবসা করব?	৩৬
রাখাল থেকে রাষ্ট্রপতি	৪৫
দিনবদলের হাতিয়ার	৪৯
ব্যবসা নিয়ে যত নেতিবাচক চিন্তা	৫৫
মনে পড়ে ক্যামব্রিজের সেই দিনগুলো	৬৪
বৃত্তের বাইরে স্বপ্নিল জীবন	৭২
সাফল্যের সবচেয়ে বড় অন্তরায়	৭৮
সংকল্পের শক্তি	৮৭
নির্মম বাস্তবতা	৯২
দ্বীনপ্রচারের সেরা মাধ্যম	১১১

কালের আবর্তনে ১১৮
শেষকথা ১২১

কেন এ বই?

[এক সফল ব্যবসায়ীর গল্প]

> কারো বুদ্ধিমত্তা পরিপক্ব হয়েছে কি না বুঝবেন কীভাবে? তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখে। সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে যাবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যার মাঝে সফল হবার ইচ্ছে নেই, তারচেয়ে বোকা মানুষ এই পৃথিবীতে আর একটিও নেই!—ইবনুল জাওযি[১]

আমার নাম খুরাম মালিক। ক্লায়েন্ট আর সহকর্মীদের কাছে আমি 'দা স্ট্র্যাটেজিস্ট' নামে পরিচিত। বর্তমানে একটি কোম্পানিকে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি-পরামর্শ আর দিকনির্দেশনা প্রদানের কাজে নিয়োজিত রয়েছি।

১৬ বছর বয়স থেকেই আমি ব্যবসার মধ্যে আছি। ব্যবসায় ইসলামিক মনোভাব কীভাবে আমায় সাহায্য করল, সেই অভিজ্ঞতা শেয়ারের জন্যই কলম ধরা। বইটি কোনো ফিকহ-চর্চার বই নয়। ব্যবসার ক্ষেত্রে ইসলাম কী বলে আর বলে না, সেসব কথা খুঁজে পাবেন না এখানে। বইটি আসলে এক আধ্যাত্মিক গাইড। বহু মানুষের কাজে এসেছে এ বই। আপনার জন্যও হতে পারে সমানভাবে কার্যকর।

আমি বদলে দিতে চাই ব্যবসাপাতি নিয়ে মুসলিমদের চিন্তাভাবনা। আমি চাই মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলো নেতৃত্বের স্থানে যাবে।

---

[১] *সাইদুল খাতির*, পৃষ্ঠা : ২৮; *সাইদুল আফকার*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৩২৬

আমার সবচেয়ে বড় দুনিয়াবি স্বপ্ন কী জানেন? আমার স্বপ্ন মুসলিম ব্র্যান্ডগুলো মানুষের পছন্দের তালিকার শীর্ষে থাকবে, মানুষ এগুলোকে সমীহ করবে। আমি চাই এগুলোর স্থান হবে মানুষের ঘরে ঘরে। আমার ইচ্ছা মুসলিম উদ্যোক্তারা হবেন বাজারের লিডার। তারা নতুন নতুন উদ্ভাবনে থাকবেন সবার চেয়ে এগিয়ে। তাদের সফলতা আর সম্পদ তারা ব্যবহার করবেন সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে।

এক ভাই আমাকে বলেছিলেন, 'আপনি তো ভাই অনেক দিন ধরে এই লাইনে আছেন। আপনার জীবনে অনেক উত্থান-পতন হয়েছে। কিন্তু এসব তো সবার জীবনেই ঘটে। তবে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো অন্য সবার মতো নয়। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে জ্ঞান দিয়েছেন। ব্যবসাটা আপনি সত্যিই ভালো বোঝেন। নবিজির সুন্নাহ অনুসারে কীভাবে ব্যবসা করতে হবে, তাও আপনি জানেন। পাশাপাশি দুনিয়ার হাল-হাকিকত সম্পর্কেও রয়েছে আপনার অগাধ পাণ্ডিত্য। আমার বিশ্বাস, একমাত্র আপনিই আমাকে ব্যবসার নিগূঢ় কৌশলটা ধরিয়ে দিতে পারবেন। কীভাবে সেই কৌশল ব্যবসায় প্রয়োগ করব, সেটাও আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন। আল্লাহ আপনাকে যে বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন, তা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। তার কথা শুনেই আমি এ বইটি লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

☆☆☆

তখন আমার বয়স মাত্র ১৪। চাকরিবাকরি করে আব্বু যে সামান্য কিছু জমিয়েছেন, ভাবছেন সেটা কোথাও খাটাবেন। কিন্তু কীভাবে কী শুরু করবেন নিশ্চিত নন তিনি। আব্বু আমাকে শেয়ার মার্কেটের[১] লিফলেট ধরিয়ে দিয়ে দেখতে বললেন—

---

[১] এটা লেখকের কিশোর বয়সের একটি পারিবারিক ঘটনা, যা শেয়ার মার্কেটের বৈধতার ক্ষেত্রে অন্যদের জন্য দলিল বা উৎসাহের কারণ হতে পারে না। সম্ভবত লেখক এ ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করেছেন তার ব্যাবসায়িক জীবনের সূচনাটা কীভাবে হয়েছিল তা বর্ণনা করার জন্য, এটা হালাল ও ইসলাম-অনুমোদিত ব্যবসা সেটা বোঝানোর জন্য নয়। এমনিতেও ছোট কিংবা বড় কোনো আলিমও যদি প্রচলিত শেয়ার মার্কেটের ব্যবসা করেন, তবু তা অন্যদের জন্য দলিল বা অনুসরণযোগ্য হতে পারে না, সেখানে একজন ১৪ বছরের কিশোরের পারিবারিক ঘটনার কথা তো বলাই বাহুল্য।

আধুনিক পুঁজিবাদব্যবস্থায় শেয়ার মার্কেটের লেনদেনকে সমকালীন বিজ্ঞ ফকিহগণ হারাম বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এতে সুদি কারবার, হারাম পণ্যের লেনদেন, শিরকত বা যৌথ বিনিয়োগের শর্ত লঙ্ঘন, ধোঁকা, জুয়া ইত্যাদি পাওয়া যায়, যার একটির অস্তিত্বই যেকোনো লেনদেন হারাম হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আলিমগণ কঠিন কিছু শর্তের ভিত্তিতে সীমিত পরিসরে এটার অনুমোদন দিলেও বাস্তবতা হলো, এসব শর্তপালন বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অসম্ভব আর সেটা পশ্চিমা পুঁজিবাদব্যবস্থার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ

কীভাবে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়, কাজ শুরু করতে হয়। ছুটির মধ্যে পুরো ব্রোশার পড়ে শেষ করে যা যা শিখেছি সব জানালাম মাকে। মা জানালেন বাবাকে।

তারপর এলো সেই দিন। আমরা শেয়ার কিনব। আব্বু দরকারি কাগজপত্রের কাজ সারলেন। আবেদনপত্র পূরণ করলেন। শুরু হলো আমাদের শেয়ার কেনা।

২ বছর পর আমাদের ২ হাজার পাউন্ডের বিনিয়োগ গিয়ে দাঁড়ালো ২০ হাজারে। এর মাঝে অবশ্য কমবেশি হয়েছে কয়েকবার।

মিথ্যে বলব না, প্রায় পুরোটা সময় শেয়ার কেনাবেচা ছিল অনুমান-নির্ভর। আমার ভাগ্য ভালো ছিল। অবশ্য আর্থিক পরমার্শদাতাদের সঙ্গে ইমেইল চালাচালি হয়েছিল আমার। তাদের সাথে শেয়ার করছিলাম আমার বিনিয়োগ ধারণা। তারা আমাকে বিভিন্ন উপকারী টিপস দিচ্ছিলেন। তারা অবশ্য বুঝতে পারেননি ওপারে বসে এসব ইমেইল টাইপ করছে মাত্র ১৪ বছরের এক কিশোর।

ছোটবেলা থেকে কম্পিউটার আর প্রযুক্তির বিষয়ে আমার মারাত্মক ঝোঁক। আমার বয়স তখন ১৬। আমার বন্ধুরা বড় রাস্তার ধারে ম্যাকডোনাল্ডসের মতো দোকানগুলোয় কাজ নিচ্ছিল। আর আমার আব্বু আমাকে চাকরি নিয়ে দিলেন এক কম্পিউটারের দোকানে। দোকানের মালিক আমাকে অল্পকিছু সম্মানীর বিনিময়ে পিসি বানানো আর উইন্ডোজ ইনস্টল দেওয়া শেখাবেন।

১ বছরে ৫ শয়েরও ওপরে পিসি বানিয়ে দিলাম আমরা। এই অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে আমি আর আমার বন্ধু অ্যান্ড্রু ঠিক করলাম বাসা থেকে আমরা নিজেরাই তাহলে পিসি বানিয়ে বেচি।

দুজনে মিলে প্রথমে গ্যারেজ সাফ করলাম আমরা। দেওয়ালের রং করলাম সাদা। আর ডিসপ্লে হিসেবে রাখলাম আমার নিজের ডেস্কটপ। আব্বু অবশ্য আমার এই কাজে খুশি ছিলেন না। আমার পড়াশোনার সুবিধার জন্য তার দুই মাসেরও বেশি সময়ের বেতন দিয়ে ডেস্কটপটা কিনে দিয়েছিলেন ওই সময়ে।

মতের প্রবক্তারাও এ তিক্ত বাস্তবতা স্বীকার করেন। তাছাড়াও এসব শর্তের বিষয়টি ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকেও যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ। এজন্য তারাও এসব কারবার থেকে মানুষকে যথাসম্ভব দূরে থাকার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। মোটকথা, শেয়ার মার্কেটের ব্যবসা শারয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণরূপে হারাম বা কমপক্ষে মারাত্মক সংশয়পূর্ণ একটি লেনদেন। তাই এ ধরনের লেনদেন থেকে অবশ্যই আমাদের বিরত থাকতে হবে।—শারয়ি সম্পাদক

দোকান রেডি। আমি আর অ্যান্ড্রু মিলে কয়েক দিন আশপাশের এলাকায় লিফলেট বিলালাম। সপ্তাখানেক বাদে এক যুবক আমাদের দোকানে এলেন। ২ শ পাউন্ড ধরিয়ে বললেন তার জন্য একটি পিসি বানিয়ে রবিবার রাতের মধ্যে যেন ডেলিভারি দিয়ে দিই।

আমাদের প্রথম পিসি বেঁচে লাভ হয়েছিল ২৮৬ পাউন্ড। আমার মতো হালকা-পাতলা লাজুক ছেলের জন্য এ যেন লাখ টাকা। রাতে নিজের ঘরে যাবার সময় শুনি আব্বু আম্মুকে বলছেন, 'আমার মনে হয় ওদেরকে একটু হেল্প করা দরকার। ওদের কাজকারবার দেখাশোনার জন্য একজন বড় মানুষ থাকলে ভালো হবে।'

আব্বু অফিসে গিয়ে কলিগদের বলতেন, আমার ছেলে কিন্তু কম্পিউটার বানায়। প্রতি ডেস্কে একটি করে কম্পিউটার থাকার বিল গেইটসের যে স্বপ্ন তা তখনো বাস্তব হয়নি। ওই সময়ে প্রায় সবাই একটা কম্পিউটারের মালিক হতে এক পায়ে খাড়া। ইন্টারনেট তখনো অত পরিচিত শব্দ না। বাবা-মায়েরা তখন সন্তানদের কম্পিউটার কিনে দেওয়ার কথা ভাবতেন কেবল ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার সুবিধার জন্য।

প্রতিদিন কিছু না কিছু পিসি ডেলিভারি করতে লাগলাম আব্বুর কলিগদের, তার বন্ধুদের। একটা সময়ে দেখা গেল গ্যারেজে জায়গা কুলোচ্ছে না। কিন্তু চাহিদা তো বাড়ছে দিন দিন। ওদিকে তখন পার্টিগুলোতে সবার মুখে কম্পিউটার-কম্পিউটার রব। আব্বু এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে তার এক কলিগের ভাইয়ের সঙ্গে কম্পিউটারের দোকান দিতে চাইলেন। প্রথমে আমাদের প্ল্যান ছিল ওই লোক দোকানে বসবেন প্রতিদিন। আর আব্বু প্রাথমিক পুঁজিটা দেবেন। আব্বু চাচ্ছিলেন না, ডিগ্রি অর্জনের আগে আমি এই কাজে খুব বেশি জড়াই।

কিন্তু বিধি বাম। ওই লোক প্রথম দিন থেকেই লাপাত্তা। শেষে আমাকেই যেতে হলো।

সকালে ভার্সিটি যেতাম। আর দুপুরে থাকতাম দোকানে। কাস্টমারদের সাথে গপসপ, পিসি বানানো, নতুন স্টক অর্ডার, টালি খাতায় হিসেব তোলা, ব্যাংকে টাকা জমা—সপ্তায় ৬ দিন এই ছিল আমার কাজ। ১৮ বছরের এক তরুণের জন্য কম না কিন্তু।

আমার চাচার এক বন্ধুর কম্পিউটার ব্যবসা তখন থমকে যায়। যখন ভালো চলত ৩০ হাজার পাউন্ড লাভ হতো। ওই লোকই আমার প্রথম কম্পিউটার বানিয়ে দেয়। আমি বসে বসে দেখতাম সেটা। পরে যখন দোকান দিলেন, আমি মাঝে মাঝে যেতাম। অনেক কিছুই শিখেছি তার কাছে। ওসব অভিজ্ঞতা আর আমার কৌতূহল ধীরে ধীরে আমার পালে হাওয়া দিয়েছে। কম্পিউটার আমার ভালো লাগত খুব। নতুন নতুন চিন্তা-ধারণা বাজিয়ে দেখতে ভালো লাগত। এগুলোই আমাকে এগিয়ে নিয়েছে। আরেকটা গুণ ছিল আমার। কোনো কিছু জানার জন্য প্রশ্ন করতে একদমই ভয় পেতাম না আমি।

আমাদের দোকান তখন সবে ব্রেক-ইভেনে এসেছে। আব্বুর কিছু বন্ধুবান্ধব ঠিক করলেন তারাও এই ব্যবসা করবেন। আমাকে মাঝে মাঝেই আব্বু পাঠাতেন তাদের বিভিন্ন বিষয় জানাতে। আমার মতো এক তরুণ কিনা বয়স্ক মানুষদের শেখাচ্ছে!

আমাদের দ্বিতীয় দোকান শুরু করলাম যখন ক্যামব্রিজ থেকে ইন্টার্ন করে আসি। তত দিনে শেখা হয়েছে অনেক—ভালো কর্মী কীভাবে নিতে হয়, কাস্টমারদের কীভাবে বোঝাতে হয়, কেন বড় কোনো ব্র্যান্ডের দোকান থেকে না নিয়ে আমাদের থেকে নেবেন, সাপ্লায়ারদের সাথে কীভাবে আরো ভালো করে বনিবনা করতে হয়, কীভাবে আরো বেশি কাস্টমার পাওয়া যায়।

ওই বছর আমাদের কম্পিউটার দোকান থেকে লাভ হয় প্রায় ১ মিলিয়ন পাউন্ড। বয়স তখন আমার মাত্র ২০ বছর!

☆☆☆

কেন যে উদ্যোক্তা হয়েছি তা আমি নিজেও জানতাম না অনেকদিন। কীভাবে হয়েছি বলতে পারতাম। কিন্তু কেন হয়েছি বলতে পারতাম না। যদি কোনো একটা কারণ বলতে হয়, তা হলে সেই কারণ সম্ভবত এটাই—এক লোককে আমি দেখতাম প্রতিদিন কাজে যাবার জন্য মুখিয়ে থাকেন। কাজ করতে তার ভীষণ ভালো লাগে। আমার আব্বু-আম্মু মিলে যা উপার্জন করেন, তিনি তাদের অর্ধেক বয়সে তারচেয়ে বেশি ইনকাম করেন। তিনি মেহনত করতেন প্রচুর।

আর এদিকে দেখতাম আমার আব্বুর কপালে বন্ধকি শোধের ভাঁজ। অফিসে বসের দুর্ব্যবহারের কষ্ট। অফিসে কারো কারো বেলায় এক ধরনের বৈষম্য হয়। আব্বু

ছিলেন তার শিকার।

আম্মু শিক্ষক হিসেবে ছিলেন বেশ আন্তরিক, উৎসাহী, মেহনতি। কিন্তু তারপরও কত সময় দেখেছি কাজ করতে করতে কষ্টে তার কান্না আসছে। খরচ মেটানোর জন্য এই ধরনের মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত হবার কোনো কারণ খুঁজে পাইনি আমি।

আরেকটা কারণ—আমি কম্পিউটার ভালোবাসি।

ভার্সিটি শেষ করলাম যখন, যুক্তরাজ্যের এক শীর্ষস্থানীয় টেলিকম কোম্পানি ইউরোপের সঙ্গে বৈশ্বিকভাবে একীভূত হচ্ছিল। একীভূত হবার পর মধ্যপ্রাচ্যেও ওরা ভালো কিছু চুক্তি করতে পেরেছিল। তখনই প্রথম বুঝলাম বড় বড় ব্যবসাগুলো বিশ্বে কী ধরনের প্রভাব রাখে। অবকাঠামোর গুরুত্বও বুঝলাম। ধারণা পেলাম কীভাবে এসব ব্যবসা অর্থনীতি, সমাজ আর রাজনীতির নিয়ামক হয়ে ওঠে।

আরো অনেক কিছু শেখার বাকি তখন। সম্ভাবনাগুলো ধরতে শুরু করলাম। হৃদয়ের মানসপটে এঁকে নিলাম আমার জীবনের মাকসাদ—এমন একটি অবকাঠামো তৈরি করব যার দ্বারা সমাজের মানুষগুলো উপকৃত হবে। তবে তখনো জানতাম না, কোথা থেকে কী শুরু করব। শুধু জানতাম যদি উদ্যোক্তা হবার মাঝে লেগে থাকি, নিজের পথ নিজেই করে নিতে পারব।

আজও এটা আমার মূল প্রেরণা—সমাজের কল্যাণে বাণিজ্যিক সংগঠন তৈরির কাজটিকে সবাই লঞ্চিং প্যাড হিসেবে জানে। কথাটা বলতে বলতে পচে গেছে। তবু বলব, বিষয়টা শুধু টাকা কামানোর বিষয় না। মিলিয়নিয়াররা নিজেদের আর্থিক স্বাধীনতা তৈরি করে। তারা ভালো গাড়ির মালিক হয়, বাড়ির মালিক হয়। অর্থাৎ মিলিয়নিয়াররা নিজের দুনিয়া বদলায়। আর বিলিয়নিয়াররা বদলে দেয় সারা পৃথিবী।

অগ্রপথিক

[লক্ষ্য যখন মানবতার কল্যাণ]

> সমাজের ক্ষুদ্র কোনো চিন্তাশীল নিবেদিতপ্রাণ গোষ্ঠী দুনিয়া বদলাতে পারবে কি পারবে না—এ নিয়ে কখনো সন্দেহ করবেন না । সত্যি বলতে কি—পরিবর্তনগুলো সবসময় এভাবেই হয়েছে।—মার্গারেট মিড

এক লোক নিজের বেডরুম থেকে শুরু করেছিলেন অনলাইন জুতোর দোকান। তার দোকান থেকে কোনো জুতো কিনলে সেটা রিটার্ন করার সুযোগ থাকত গুনে গুনে ৩৬৫ দিন! মানে ধরুন, কেউ জুতো কিনল জানুয়ারি মাসে। ১০ মাস পর তিনি যদি সেটা ফেরত দিতে চান—পারবেন। আরো মজার বিষয় হলো, পাঠানোর জন্য একটা টাকাও খরচ করতে হবে না তাকে।

কোম্পানির গ্রাহকসেবাও ছিল নজর কাড়ার মতো। কর্মীদের বলে দেওয়া থাকত, তারা যেন কল শেষ করতে কখনো তাড়াহুড়ো না করে। গ্রাহককে 'খুশি' করতে যতক্ষণ লাগে লাগুক। একবার তো একটি কল চলেছিল ৯ ঘণ্টা! ভাবা যায়, ৯ ঘণ্টা!

এক ভদ্রমহিলার মা ছিলেন খুব অসুস্থ। দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি। তিনি মায়ের জন্য ৬ জোড়া জুতো কিনলেন। ভাবলেন, জুতো দেখে মা বুঝি খুশি হবেন! কিন্তু পরের দুই সপ্তায় মায়ের শরীরটা আরো বেশি খারাপ হয়ে গেল। মহিলা ভাবনায় পড়ে গেলেন। এতগুলো জুতো নিয়ে তিনি এখন কী করবেন? সিদ্ধান্ত

নিলেন, জুতোগুলো ফেরত দিয়ে দেবেন। গ্রাহকসেবা বিভাগ ফেরত দেওয়ার কারণ জানতে পেরে অদ্ভুত এক কাজ করে বসল। তারা ওই ভদ্রমহিলার মায়ের জন্য পাঠাল এক তোড়া ফুল। আর কার্ডের মাধ্যমে উইশ করল—গেট ওয়েল সুন! আর জুতোগুলো তারা হাসপাতাল থেকেই ফেরত নিলেন কোনো খরচ ছাড়াই। সেই সাথে ভদ্রমহিলার অ্যাকাউন্টটিকে করে দিলেন ভিআইপি। এই কোম্পানির গ্রাহকেরা সবচেয়ে খুশি থাকবেন না তো আর কারা থাকবে!

তাদের কর্মীনিয়োগ প্রক্রিয়াটিও বেশ বৈচিত্র্যময়। নতুন যোগ দেওয়া সবাইকে অন্তত সপ্তাখানেক কাজ করতে হয় গ্রাহকসেবা বিভাগে—তা সে হোক ম্যানেজার, প্রোগ্রামার কি অ্যাকাউন্টেন্ট। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের একটা সুযোগ দেওয়া হয়। যতদিন কাজ করেছে ততদিনের বেতন, সাথে ২ হাজার ডলার বোনাস নিয়ে তারা চাইলে চাকরিটা না-ও করতে পারে। নতুন কর্মীরা এতে খুব সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে, চাকরিটা করে তারা আনন্দে থাকতে পারবে কি না। পুরো মন লাগিয়ে কোম্পানির কাজ করে যেতে পারবে কি না।

এই কোম্পানির নাম জ্যাপোস (Zappos)। তাদের কর্মীসংখ্যা ১৫ শয়েরও বেশি। ২০০৯ সালে অ্যামাজন এটা কিনে নেয় ১.২ বিলিয়ন ডলারে!

কোম্পানির এ ধরনের চমকপ্রদ নিয়মকানুনের ব্যাপারে জ্যাপোসের প্রধান নির্বাহী টনি শে বলেছেন—

'বেশিরভাগ কর্মক্ষেত্রে মানুষের ভেতরকার প্রতিভা আজীবন চাপা থেকে যায়। আমি চাই সেটা বেরিয়ে আসুক। আমি এমন একটা পরিবেশ দিতে চেয়েছি সবসময়, যেন প্রতিটি মানুষের নিজস্ব গুণ ও যোগ্যতা বেরিয়ে এসে সবার মাঝে আলো ছড়িয়ে দেয়।'

☆☆☆

এক কিশোরের স্বপ্ন সে গ্রাফিক ডিজাইনার হবে। কিন্তু কাজ পাচ্ছে না। লোকে মনে করে সে 'বাচ্চা'। স্থানীয় কিছু কোম্পানিতে সে গিয়ে ধরনা দিয়েছে। কিন্তু তারা জানতে চায় সে আগে কোনো কাজ করেছে কি না। অনেকটা ডিম আগে না মুরগি আগে ধরনের সমস্যা।

একদিন সে ঠিক করল, একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের জন্য সে ডিজাইন করে দেবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। তার মনে হলো এতে একদিকে কাজটা যেমন কল্যাণকর হবে, পাশাপাশি তার অভিজ্ঞতার ঝুলিটাও ভরে উঠবে। তার প্রতি মানুষের আস্থা তৈরি হবে।

অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের মালিক পছন্দ করলেন তার কাজ। তিনি অন্যদের কাছে বললেন তার কাজের কথা। ধীরে ধীরে সেই কিশোরের হাতে আসতে লাগল সম্মানীসহ কাজ।

অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে যেহেতু ফায়দা এসেছে, সম্মানীসহ কাজের পাশাপাশি সে অর্ধেক সময় দিতে লাগল অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানে। মানুষজনের কাছে ছড়িয়ে পড়ল তার কাজ আর প্রতিভা। সে তখন আর 'বাচ্চা' রইল না। এখন সে একজন পুরোদস্তুর প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইনার। নিমিষেই দৃষ্টিনন্দন লোগো আর মনকাড়া লিফলেট বানানোই তার কাজ।

নিজের কাজে এই কিশোর খুব মজা পেত। ধীরে ধীরে তার কাজের শান বাড়ল আরো। ঠিক করল এমটিভি অ্যাওয়ার্ড প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। আর কী আশ্চর্য, প্রথম পুরস্কারটা তার ঝুলিতেই ঠাঁই করে নিল। দিকে দিকে আরো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল তার প্রতিভার খবর। তার হাতে আসতে লাগল নতুন নতুন সব কাজ।

তার ডিজাইন কোম্পানিতে এখন সাড়ে ৩ শয়ের ওপরে কর্মী আর স্বেচ্ছাসেবী কাজ করে দুনিয়াজুড়ে। ডিজনি আর ইউনিসেফের মতো ক্লায়েন্ট আছে তার। তবে এখনো তার প্রতিষ্ঠান 'ভেরিনাইস' (VeryNice) ধরে রেখেছে ফিফটি-ফিফটি বিজনেস পলিসি—অর্ধেক কাজ সম্মানীসহ। বাকি অর্ধেক সময় অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে। ২০১৪ সাল নাগাদ প্রায় ২ মিলিয়ন ডলারের মতো কাজ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করে দিয়েছে ভেরিনাইস।

☆☆☆

শুনলে অবাক হবেন, ক্যালিফোর্নিয়াতে মোট উৎপাদিত টমেটোর ২৫% প্রক্রিয়াজাত করে যে কোম্পানি তাদের কোনো ম্যানেজার নেই। এই কোম্পানিতে কারো কোনো পদবি নেই, নেই পদোন্নতি বা 'ওপরের মহল'। এখানে সবাই নিজে নিজের বস। অন্যের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সিদ্ধান্ত নেয় তারা নিজে নিজে।

কোম্পানির টাকা ব্যবহারের সুযোগ আছে প্রতিটি কর্মীর। প্রয়োজনে যেকেউ খরচ করতে পারে সেখান থেকে। কোনো কনিষ্ঠ কর্মী যদি দেখে কোম্পানীর স্বার্থে ২ হাজার ডলারের চেক লিখে দিতে হবে, তার সেই অধিকার আছে।

অবশ্য এই কোম্পানির যে একক কোনো লিডার নেই তা নয়; কোম্পানির সুনির্দিষ্ট রূপকল্পও রয়েছে। তবে অন্য চিরাচরিত কোম্পানিগুলোর মতো এখানে নেই আদেশ আর নিয়ন্ত্রণ স্তরবিন্যাস। এখানে কেউ কাউকে তার কাজের জবাবদিহি করে না। কারো কাজের জন্য নেই মূল্যায়ন বা মতামত। কী করতে হবে বলা হয় না কাউকে। কর্মীরা নিজেরা নিজের চালক। যা করা দরকার তারা তা-ই করে।

মর্নিং স্টার নামের এই কোম্পানির বার্ষিক আয় ৭ শ মিলিয়নের ওপরে।

☆☆☆

এই যে জ্যাপোস গ্রাহকসেবায় সবচেয়ে নজর দেয়, ভেরিনাইস দাতব্য প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে কাজ করে, আর কর্মীদের সমতার বেলায় মর্নিং স্টারের দর্শন—এরকম প্রতিষ্ঠান কিন্তু সংখ্যায় একটা-দুইটা নয়। বহু প্রতিষ্ঠানে আছে এ ধরনের এমন কিছু রীতি যা পুরোপুরি মিলে যায় ইসলামি আদর্শের সাথে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, সেগুলোর কোনোটারই প্রতিষ্ঠাতা মুসলিম নন।

গ্রাহককে খুশি করা, কর্মীদের খুশি রাখা, পৃথিবীতে অর্থবহ পরিবর্তন নিয়ে আসার প্রতি এই যে অন্তপ্রাণ চিন্তা—এই ধরনের মানসিকতাকে বলে 'ভ্যালি' মানসিকতা। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া, যেখানে প্রথম উচ্চারিত হয় এই নাম—দা সিলিকন ভ্যালি কাঠামো বা 'ভ্যালি' মানসিকতা কিন্তু শুধু ওখানেই আটকে নেই। ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ড—নিত্যনতুন উদ্ভাবন আর ব্যবসার আঁতুড়ঘর যত জায়গা সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে এই মনোভাব। এদের নীতি ঠিক করার ধরন ঠিক এরকম—আমরা সবসময় একটা কাজ 'এইভাবে' করে এসেছি কিংবা একটা কাজ 'এইভাবে আর এইভাবে' করা হয়। কিন্তু চলো এখন নতুন করে ওই প্রক্রিয়াগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করি।

এরকম চিন্তার ফলে তৈরি হয় এমন সব কোম্পানি যারা সমাজের চিরাচরিত পরিচালন-পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে। বের করে আনে এতদিন ধরে রয়ে যাওয়া ধাঁধার সমাধান।

এ ধরনের চিন্তা থেকে তৈরি হয় অধিকতর মানবতাবোধসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। ইসলামের সোনালি সময়ে এমনই ছিল মুসলিমেরা। তারা চিন্তা করতে পারত বাক্সের বাইরে গিয়ে। ভ্যালি মানসিকতার সঙ্গে ইসলামের অদ্ভুত মিল থাকায় আমি সবসময় এটার কদর করি। আমাদের জাতির পিতা নবি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তো এই কাজটিই করেছিলেন—দাঁড়িয়েছিলেন সমাজের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে। অন্ধের মতো তিনি অনুসরণ করেননি বাপদাদার ধর্ম।

খ্যাতিমান ব্যবস্থাপনাবিদ পিটার ড্রাকার বলেছিলেন, সমাজের সমস্যা সমাধান ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য। বহু ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কর্ণধারেরা বুঝেছিলেন, সমাজে কোন জিনিস কীভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে ঠিক প্রশ্নটি করা গেলেই সমাজের সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব।

ইসলামের সাথে ভ্যালি মানসিকতার এই একটাই মিল না; আরো আছে। এই মানসিকতা চায় এসব সমস্যার সুরাহা করবে সবচেয়ে যোগ্য লোক। আর করবে সব থেকে সেরা উপায়ে। কর্মী, গ্রাহক, পরিবেশ আর সর্বোপরি সমাজের সবার মঙ্গলে কাজ করে তারা। সাধারণত বড় বড় কোম্পানিগুলোতে দেখা যায় এর ভিন্ন ছবি—লোভই মূল কারিগর এসব জায়গায়।

ভ্যালি মানসিকতা নিয়ে যারা কাজে নামে, তাদের প্রথম লক্ষ্য থাকে কীভাবে তারা গ্রাহকের সমস্যা সুরাহা করবেন। তবে সাথে সাথে তার মাথায় এটাও থাকে, কীভাবে তার কর্মীরা আনন্দে থাকবে, গ্রাহকরা খুশি হবে, সবকিছু কীভাবে সবচেয়ে সুন্দর হবে। ইসলাম তো এটাই চায়।

জীবনের প্রতিটি পরতে ইসলাম চায় ইহসান ও ইনসাফ। প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বিষয়ের প্রতি ইহসান (সম্ভাব্য সবচেয়ে ভালোভাবে সম্পাদন) করাকে অত্যাবশ্যক করেছেন...।'[১] ইসলাম বলে আপনি যা-ই করবেন সবচেয়ে ভালোভাবে করবেন। বাচ্চা মানুষ

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৯৫৫; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৮১৫; *জামি তিরমিযি* : ১৪০৯; *সুনানুন নাসায়ি* : ৪৪০৫, ৪৪১১, ৪৪১২, ৪৪১৩, ৪৪১৪; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩১৭০; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৭১১৩, ১৭১১৬, ১৭১২৮, ১৭১৩৯; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৫৮৮৩, ৫৮৮৪; *মুসতাখলাজু আবি আওয়ানাহ* : ৭৭৩৭, ৭৭৩৮, ৭৭৩৯, ৭৭৪৬, ৭৭৪৭; *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ৪৪৭৯, ৪৪৮৫, ৪৪৮৬, ৪৪৮৭, ৪৪৮৮, ৮৬০৪; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ৩০২২, ১৬০৭৭, ১৮০৪৪, ১৯১৩৭, ১৯১৩৮

করলে সবচেয়ে ভালোভাবে; ঘরদোর পরিষ্কার করলে সবচেয়ে ভালোভাবে; বই লিখলে বা ব্যবসা করলে—সবকিছুই সবচেয়ে ভালোভাবে। আমাদের কথা এবং আমাদের কাজের প্রভাব যে অনেক দূর গড়ায়, তা আমাদের বুঝতে হবে। যখন চেষ্টা হবে সেরা, ইনশাআল্লাহ আশা করি, ফলও হবে সেরা।

মুসলিম উদ্যোক্তারা তাদের সামর্থ্যের শেষ বিন্দুটুকু দিতে বাধ্য। সবকিছু করতে হবে সম্ভাব্য সব থেকে সেরা উপায়ে। ব্যবসার প্রতিটি ক্ষেত্রে ধরে রাখতে হবে এই চর্চা। কর্মীদের সাথে দুর্ব্যবহার করা যাবে না। গ্রাহকদের সামলাতে হবে উদার মানসিকতা নিয়ে। সর্বোপরি থাকতে হবে সমাজের মঙ্গল-চিন্তা।

ইসলাম চায় আমরা যেন মহাসত্যের সন্ধানে নামি। আমাদের লক্ষ্য যেন থাকে আকাশ ছোঁয়ার। ইসলাম চায় সমস্যার সমাধানে নিয়োগ করা হবে সবচেয়ে উপযুক্ত লোক।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আশেপাশে যাদের রেখেছেন, তারা সবাই ছিলেন অত্যন্ত সৎ; প্রিয় নবিজির প্রচণ্ড অনুগত। মানুষকে তিনি তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতামাফিক কাজ দিতেন। মাদিনাতে মসজিদ গড়ার সময় তিনি দেখলেন তাল্‌ক ইবনু আলি আল-ইয়ামামি রাযিয়াল্লাহু আনহু প্লাস্টারের কাজটা ভালো পারেন। তখন তাকে দিয়ে তিনি আর ইট আনা-নেওয়া করালেন না। প্লাস্টারের কাজে লাগিয়ে দিলেন তাকে।[১]

সেজন্যই বলি, পৃথিবীকে আরো সুন্দর করতে একজন মুমিনের জন্য উদ্যোক্তা হবার চেয়ে আর ভালো কোনো বিকল্প নেই।

[১] *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ইবনু সাদ, খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ৭৭; *ইমতাউল আসমা*, তাকিউদ্দিন আল-মাকরিযি, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ৯০; *ওয়াফাউল ওয়াফা*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৫৭

সাফল্যের সবচেয়ে বড় অন্তরায়

[না প্রতিভা, না বুদ্ধিমত্তা]

> আমি আপনার অহংবোধটা সরালাম। দেখা গেল, বাস্তবতা সম্পর্কে আপনার চিন্তাভাবনাকে ওটাই ঢেকে রেখেছিল মেঘে।—সামইকার্ডস.কম

ই-কমার্স তখনো আসেনি। এক বাবা আর তার ছেলে মিলে কম্পিউটার-ব্যবসা শুরু করল। কীভাবে কম্পিউটার অ্যাসেম্বল করতে হয় ছেলেটির সেটা জানা ছিল। কর্মীদের সে শেখাল এ ব্যাপারে। বিল আর হিসেবের ব্যবস্থা করে ভালো একটা সম্পর্ক হলো তার সরবরাহকদের সাথে।

ওদিকে বাবা খেয়াল রাখতেন কাগজপত্র, হিসেবের খাতা আর প্রশাসনিক বিষয়গুলো। তিনি ব্যবসাটাকে লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে দাঁড় করালেন। পণ্যের সংখ্যা বাড়াতে বিনিয়োগ করলেন। কর্মী নিয়োগ আর ছাঁটাইও করতেন তিনি।

ছেলের দায়িত্ব ছিল ব্যবসার প্রযুক্তিগত দিকগুলো দেখাশোনা করা। অন্যদিকে বাবা ছিলেন ব্যবসার ম্যানেজার।

প্রথম বছরে সব মিলে আয় হলো ১৫ লাখ ডলারের কিছু কম। ছোটখাটো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য কম না কিন্তু!

তখন সবেমাত্র লোকজন ঘরে মডেম কিনতে শুরু করেছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট

তখন অ্যামেরিকার প্রায় সব বাড়িতে। ইন্টারনেটের গতি অবশ্য তখন অত বেশি নয়।

সে সময়ে অ্যামাজন শুধু বই বিক্রি করছিল। আর ইবের বিস্তার শুধু অ্যামেরিকাতেই। বেশিরভাগ কোম্পানির তখন ওয়েবসাইট বলতে কিছু ছিল না। ওয়েবসাইট থেকে বেচাবিক্রি তো অনেক পরের কথা। কিন্তু সেই ছেলে বুঝতে পেরেছিল, একসময় ওয়েবসাইটই হবে বেচাবিক্রির নতুন হাটবাজার।

ব্যবসার লাভের টাকা ই-কমার্সে বিনিয়োগের পরামর্শ দিলো ছেলে। কিন্তু বাবা ওদিকে নজর দিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি চাচ্ছিলেন যেমন আছে তেমনই থাক। ব্যবসা ভালো চলছে। পরিবর্তনের কী দরকার? ই-কমার্সে এখন খরচ অনুপাতে লাভ তেমন হবে না। অফলাইন কেনাকাটায় লাভ বেশি থাকে কোম্পানির।

ছেলেটি বাবাকে সামনে বিশাল সম্ভাবনার কথা বোঝাতে চাইল। ভবিষ্যৎ মার্কেট ধরার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না। কিন্তু বাবা বললেন, 'দৌড়ানোর আগে হাঁটা শেখো।'

এরপর ৫ বছরের মধ্যে অ্যামাজন বেচতে শুরু করল ইলেক্ট্রিক পণ্য। ইবে ছড়িয়ে পড়ল অ্যামেরিকা ছাড়িয়ে বাকি বিশ্বে। অনলাইন মার্কেটে ছড়াছড়ি পড়ে গেল কম্পিউটার স্টোরের। এত এত প্রতিযোগিতায় ছোট্ট সেই কোম্পানিটি উড়ে গেল তাসের ঘরের মতো।

কোম্পানির আগের সেই লাভ এখন সোনালি অতীত।

☆☆☆

সিলিকন ভ্যালি থেকে খুব দূরে নয় জায়গাটা। ওখানকার এক লোক ই-কমার্সে এক বিপ্লবী চিন্তা নিয়ে এগোলেন। ই-কমার্স ততদিনে বেশ বড় ব্যবসার ক্ষেত্র। কিন্তু লোকটির মনে হয়েছিল তার আইডিয়া ই-কমার্স মার্কেটকে আরো চটকদার করবে। বাড়াবে এর সম্ভাবনা।

নিজের বিপ্লবী চিন্তায় প্রচণ্ড আস্থা ছিল তার। সম্ভাব্য বেশ কিছু বড় বড় বিনিয়োগকারীর সাথে নিয়মিত বসতে লাগল জেমস। তবে বসার আগে সবাইকে বলে নিত, এ বিষয়টা যেন তারা কারো সাথে শেয়ার না করেন। এজন্য এনডিএ

বা গোপন রাখার চুক্তিও করত। এতই আত্মবিশ্বাস ছিল জেমসের তার আইডিয়াটি নিয়ে। জেমস যে নতুন কিছু নিয়ে নামতে যাচ্ছে সেটা জানত তার পরিবার আর কাছের লোকজনও। কিন্তু তারাও জানত না, তার বিপ্লবী আইডিয়াটি যে আসলে কী।

অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টরদের কেউ কেউ মৌখিক আগ্রহ জানিয়েছিলেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে তারা প্রোডাক্টের একটা বাস্তব রূপ দেখতে চাচ্ছিলেন। জেমসের কাছে তখন আসলে ওই আইডিয়াটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কোনো বাস্তব প্রোডাক্ট বা প্রতিরূপ—কিছুই না।

এক আইটি চাকরি থেকে বেশ ভালো বেতন পেত জেমস। সে চাকরিটা ছেড়ে দিলো। স্ত্রীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাড়িটাও বন্ধক দিলো। বাড়তি টাকা দিয়ে নিয়োগ দিলো দুজন প্রোগ্রামার। শুরু করে দিলো তার প্রোডাক্টের কাজ।

সাধারণত অন্যান্য কোম্পানি একটা প্রোডাক্ট রেডি করতে যত সময় নেয়, তাদের লাগছিল এরচেয়েও প্রায় ৩ গুণ বেশি সময়। ঠিক কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে তারা কাজটি করবে সেটা ঠিক করতে করতেই সময় চলে যাচ্ছিল অনেক। জেমসের বিশ্বাস ছিল, প্রোডাক্টটা যেহেতু বের হতেই ঝড় তুলবে, শুরু থেকেই সেজন্য সবকিছু ঠিকঠাক হওয়া লাগবে।

এদিকে ওই দুই প্রোগ্রামারের সাথেও তার এনডিএ চুক্তি হয়েছিল। তারা কাজটা নিয়ে কাউকে কিছু বলতে পারবে না। করলে সাথে সাথে চাকরি হারাবে তারা।

জেমসদের বানানো সফটওয়্যারটির ফিচার কী কী হবে সেটি নিয়ে মতবিনিময় হচ্ছিল। প্রোগ্রামাররা বলল, জেমস যেসব ফিচার চাচ্ছেন সেগুলো সব করতে অনেক দিন সময় লাগবে। তারা পরামর্শ দিলো, শুরুতে অল্প কিছু ফিচার দিয়ে একটা বেটা সংস্করণ বের হোক। লোকজন ধীরে ধীরে ওটার সাথে পরিচিত হবে। ইনকামও আসতে শুরু করবে। আর ওতে নতুন নতুন বিনিয়োগও টানা যাবে। সামনে তাহলে সবগুলো ফিচার দিয়ে সফটওয়্যারটি এগিয়ে নেওয়া যাবে সহজে।

কিন্তু জেমস বলল, 'আমি জানি অন্যরাও এভাবে কাজ করে। কিন্তু আমার আইডিয়াটা এত ভালো, আমি বাজারে এত আগেভাগে ছেড়ে ঝুঁকি নিতে চাই না। আপনারা কাজ করে যান।'

প্রায় বছরখানেক পরে জেমসের টাকাপয়সায় টান পড়ল। সফটওয়্যারটির কাজ আর শেষ হয়নি। ততদিনে প্রযুক্তি জগতেও পালাবদল হয়েছে। তাদের সফটওয়্যারের অনেক কিছুই তখন সেকেলে।

জেমসের বিপ্লবী চিন্তা তো মারা গেলই, সাথে স্ত্রীর সাথে সম্পর্কটাও।

☆☆☆

২৮ কি ৩০ বছরের এক যুবক। নাম ডেভিড। কিছু দিন আগে তার বাবা মারা গেছে। ভালোই সম্পদ রেখে গেছে উত্তরসূরির জন্য।

জীবনে এর আগে কখনো ডেভিড কাজ করেনি। এবার সে ঠিক করল কিছু করবে। সে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজ ধরল।

মাসখানেকের মধ্যে এক ক্লায়েন্টের অর্ডার এলো। তারা ব্যবসার জন্য নতুন ওয়েবসাইট খুলবে। ডেভিড ওটা তৈরি করে দেবে।

এসব কাজে যত লোক দরকার, ডেভিড নিল তারচেয়ে দুই গুণ বেশি লোক। কাজ শুরুর আগে জাঁকজমক এক পার্টিও দিলো। ভাড়া নিল তিন তলা অফিস। দলের সবাই আপত্তি করল ডেভিডের এমন সিদ্ধান্তে। যেখানে এক তলার মধ্যেই সবার জায়গা হয়ে যায়, সেখানে তিন তিনটি তলা তো অনেক বেশি।

কাজ শুরু হলো ওয়েবসাইট বানানোর। যারা কাজ করছিলেন, বললেন চাকরির নিয়োগপত্রে কিছু সমস্যা আছে। আর ডেভিড যেভাবে ওয়েব ডেভেলপ করতে চাইছে, যে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চাচ্ছে, আর যেভাবে লোকজনদের কাজ ভাগ করে দিয়েছে সেটা তেমন ফলপ্রসূ হবে না।

কর্মীদের মধ্যে একজনের অভিজ্ঞতা ছিল বেশি এসব কাজে। বাকি সবার চেয়ে তিনিই এসব বিষয় বারকয়েক নজরে আনলেন ডেভিডের।

একদিন দুপুরে খাবার সময় তার সঙ্গে ডেভিড বিশেষ মিটিংয়ে বসল। তাকে সাবধান করে বলল এসব বিষয়ে বেশি নাক না গলাতে। আর বাকিদের প্রথম সপ্তার বেতন কেটে নিল এত 'মতামত' দেওয়ার কারণে।

চাকরি খোয়ানোর আশঙ্কায় কেউ আর সামনে কোনো রা করল না। নীরবে কাজ করতে লাগল।

কর্মীদের মধ্যে দিনদিন কাজ নিয়ে টেনশন শুধু বাড়লই। অনেক কাজ রয়ে গেল আধা খেঁচড়া। কোনো কোনো কাজ করতে হতো দু-তিন বার। কোনো কোনো কাজ তো রয়ে যেত একদম অসম্পূর্ণ। কাজের মতিগতি দেখে তাদের মনে হচ্ছিল ক্লায়েন্ট সম্ভবত কাজ শেষে কোনো পয়সাই দেবে না। কিন্তু ডেভিড নাছোড়বান্দা। সে বলল, সে বেশি জানে। কর্মীরা তাদের কাজে মন দিক।

এদিকে ডেভিড নিজে মৌজমাস্তি করে বেড়াচ্ছিল। এই ইউরোপে তো এই অ্যামেরিকায়। কখনো স্কাই ডাইভিং করছে, কখনো খেলছে টেনিস। মন ভালো না থাকলে সৈকতে বসে বসে গিলছে পিনা কোলাডাস।

আর মাঝে মাঝে কিছু নামকরা লোকদের সঙ্গে ব্যাবসায়িক বৈঠক। এসব বৈঠকে সে জাহির করত, অল্প কদিনের মধ্যে 'ত্রিশের নিচে ত্রিশ' সেরা সিইও-দের তালিকায় নাম উঠবে তার। প্রতি বছর একটা ম্যাগাজিন সেরা ৩০ সিইও-র তালিকা ছাপে। ডেভিড ধরেই রেখেছিল এ বছর তার নাম সেখানে উঠছেই।

ওদিকে অফিসে ডেভিডের পরিচালনার ধকল যা যাবার সব যাচ্ছিল কর্মীদের ওপর দিয়ে। অবস্থা এত নাজুক, কর্মীরা কষ্টে কাঁদছিল পর্যন্ত।

বহুদিন বাদে একদিন ঘুরেফিরে অফিসে উদয় হলো ডেভিড। এসে দেখে কাজ এখনো শেষ হয়নি। পুরো টিমকে দাবড়ানি দিলো সে। বড়দিন আর নববর্ষের ছুটিতেও তাদের কাজ করতে হলো রাতদিন করে।

বড়দিনে এবার আর ক্রিস্টিনার ডিনার করা হলো না মায়ের সাথে। বড়দিনের সকালে কেনের কাছে ডেভিডের ফোন এলো। যেকরেই হোক নতুন বছরের মধ্যে কাজ শেষ করা চাই। আর কাজের চাপে লিওনার্ড সময় কাটাতেই পারছিল না তার নতুন জন্ম নেওয়া কন্যার সাথে।

যে কাজ করতে নাকি ৪ মাস লাগে, ৫ মাস পরেও সেই কাজ শেষ হয় না। ক্লায়েন্ট প্রচণ্ড ফুঁসে গেল। চাকরি ছেড়ে দিলো ডেভিডের বেশিরভাগ কর্মী। আর ওদিকে ব্যাংকের দেনায় জর্জরিত সেই কোম্পানি।

☆☆☆

এক বিশাল বড় টেক কোম্পানির সাবেক জ্যেষ্ঠ ডেভেলপার ছিলেন ওয়েন। একবার তিনি চিন্তা করলেন, নিজেই এক আইটি কোম্পানি দেবেন।

কেভিন নামের কম অভিজ্ঞ একজনের সঙ্গে মিলে তিনি চালু করলেন নিজের কোম্পানি। শহরের ছোট ছোট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে আইটি সহায়তা দিতেন তারা।

শুরু থেকেই ওয়েন আর কেভিনের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব চলছিল কে হবে কোম্পানির মূল পরিচালক এই নিয়ে। ওয়েন বলছিলেন, তার পরিচালনায় না চললে কোম্পানি কখনোই আগাবে না। প্রায় ২ বছর এই নিয়ে শীতল লড়াই চলার পর কেভিন হাল ছাড়লেন। পরিচালনার পুরো দায়িত্ব নিলেন ওয়েন।

ওয়েন সামনের দু-বছরে কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট আর বিজনেস ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম ভালো করে দাঁড় করালেন। নতুন আর কোনো গ্রাহক ধরলেন না এই পুরোটা সময়। নজর রাখলেন শুধু পুরোনো গ্রাহকদের ওপর। আর ওদিকে দাপ্তরিক কাগজপত্র আর ট্যাক্সের নথিপত্র ঠিকঠাক রাখায় সময় দিলেন।

কেভিন বলছিলেন পুরোনো গ্রাহকদের পাশাপাশি নতুন গ্রাহক জোটানোর দিকেও নজর দেওয়া হোক। আর নিজেদের কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট আর বিজনেস ইন্টেলিজেন্সের বদলে তার পরামর্শ ছিল কাজটা অন্যদের হাতে ছাড়া হোক। এতে তারা ব্যবসার মূল জায়গায় বেশি নজর দিয়ে লাভ বাড়াতে পারবে।

জবাবে ওয়েন বলেছিলেন, 'ব্যবসার কিছুই জানো না তুমি। ১০ লাখ টাকার বিজনেস দাঁড় করাতে সিস্টেম ভালো হতে হয়। আমরা ওই কাজগুলো অন্যদের দিতে পারব না। আমি যা করছি তাতে অন্ধের মতো আস্থা রাখো, বুঝলে? তুমি তোমার কাজ করে যাও।'

তৃতীয় বছরে ব্যবসা তো সামনে আগালোই না। উলটো পুরোনো গ্রাহকদের থেকেও লাভের অঙ্ক অর্ধেক হয়ে গেল। কেভিন আর পার্টনার নেই। কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট আর বিজনেস ইন্টেলিজেন্সে নিরাপত্তা ত্রুটি দেখা গেল। ওদিকে সময়মতো করের কাগজপত্র জমা দিতে না পারায় কর কর্তৃপক্ষ কোম্পানির বার্ষিক লেনদেনের ওপর ২০% জরিমানা চাপাল।

☆☆☆

লেংলির মতো তুখোড় লোক থাকতেও প্রথম সফল বিমান বানালেন কিনা রাইট ব্রাদারস!

কী ছিল না লেংলির? হার্ভার্ডে পড়াশোনা করেছেন। সরকারের কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ। তার সঙ্গে কাজ করছিলেন ইঞ্জিনিয়ারদের বিশাল দল। সময়ের সবচেয়ে পাকা মাথারা সব একসাথে হয়েছিল উড়োজাহাজ নির্মাণে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিনা বিমান বানানোর মুকুটটি পেয়ে গেল দুই রাইট ভাই। যাদের না ছিল খুব বেশি পড়াশোনা আর না এত এত টাকাকড়ি।

অহংকার মানুষের আস্থা নষ্ট করে। অন্যদের মনোবল ভেঙে দেয়। মানুষের সৃজনশীলতাকে ফুটতে দেয় না। অথচ উদ্ভাবনের জন্য সবার আগে চাই সৃজনশীলতা। এটা এক নতুন আলো জ্বালানোর মতো।

উস্তায নোমান আলি খানের এক মশহুর লেকচার আছে মানুষের ইগো নিয়ে। তিনি বলেছিলেন, যারা অন্যের উদ্ধত স্বভাবের দিকে আঙুল তুলে, সাধারণত দেখা যায় তারাই বেশি উদ্ধত। তারা অন্যের ভুলচুক নিয়ে এত মজে থাকে, নিজের খামতি দেখার সময়ই পায় না।

এই অংশটুকু পড়ার সময় আপনার মনে যদি ইগোওয়ালা কোনো মানুষের ছবি ভেসে ওঠে, তাহলে সম্ভবত আপনার মধ্যেও আছে ইগোজনিত সমস্যা।

১৯৯৯ সালে ডেভিড ডানিং আর জাস্টিন ক্রুগার একটি গবেষণা করেছিলেন। তাদের কাজটির নাম ছিল, 'আনস্কিলড অ্যান্ড আনঅ্যাওয়ার অব ইট—হাউ ডিফিকাল্টিজ ইন রিকগনাইজিং ওয়ান'স ওউন ইনকামপিটেন্স লেড টু ইনফ্লেটেড সেলফ-অ্যাসেসমেন্টস'। মানুষের স্বভাবের একটি দিক তারা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন এই গবেষণাপত্রে। পরে সেটা পরিচিতি পায় 'ডানিং-ক্রুগার ইফেক্ট' নামে। তারা দেখিয়েছেন, মানুষের মধ্যে একটা একমুখী চিন্তা আছে। অদক্ষ লোকেরা নিজের মুনশিয়ানা নিয়ে এক ধরনের মোহে ভোগে। একটা কাজে তারা যত না দক্ষ, ভাবে তারচেয়ে কয়েক গুণ। তাদের মতে, নিজের সামর্থ্যের ব্যাপারে ঠিক জ্ঞান না থাকলে মানুষ সেটাকে আসলের চেয়ে বড় করে দেখে। আর যার সেই সাথে অন্যের সামর্থ্যের ব্যাপারে ঠিক জ্ঞান নেই, সে নিজের সামর্থ্যকে দেখে আরো বেশি বড় করে।

ভালো সিদ্ধান্ত যিনি নিতে পারেন, তার হাতেই হয় বড় বড় কাজের বাস্তবায়ন। তবে ইগো যার মধ্যে চেপে বসে, শুরুতে হয়তো বিষয়টার ভয়ঙ্কর দিক টের পাওয়া যায় না। সাগরে কোনো জাহাজ যখন একটু একটু করে ভুল দিকে যায়, সেরকম। শুরুতে কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু যখন বোঝা যায় জাহাজটা ঠিক পথে নেই, ততক্ষণে অনেক দূর পাড়ি দেওয়া হয়ে গেছে।

আজকাল মানুষের কাছে বাছাই করার সুযোগ অনেক। টাকাপয়সা খরচ এখন মানুষ করে মুড়িমুড়কির মতো। এখন কোম্পানির ব্যাংক-ব্যালেন্স শুধু কাস্টমারের টাকায় ফাঁপে না। এর সঙ্গে থাকে কোম্পানিকে গ্রাহক কী চোখে দেখে। আর তাই আজকাল কোম্পানির হর্তাকর্তাদের চোখের সামনে থেকে সরাতে হবে অহংকারের ঠুলি। এমন কত কোম্পানি আজ ডুবে গেছে কেবল পরিচালকদের নাক উঁচু স্বভাবের কারণে। কর্মী বা গ্রাহকদের কথা শোনা মানে তো কেবল কান দিয়ে ঢোকা না। মগজে পৌঁছানোও।

ফোর্ড গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ডকে নিয়ে একটা কথা চালু আছে। কথাটা অবশ্য তিনি আসলেই বলেছিলেন কি না তার প্রমাণ নেই। যা হোক, তিনি নাকি একবার বলেছিলেন, 'লোকজন আসলে কী চায়, এটা যদি জিজ্ঞেস করতাম, তবে তারা বলত, আরো বেশি দ্রুতগামী ঘোড়া!'

কথার পেছনের ভাবনাটা হয়তো সত্য। কিন্তু মানুষজনকে মোটর গাড়িতে করে নিরাপদে আর দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তার যে চিন্তা, সেটা কিন্তু এমনি এমনি আসেনি। মানুষের মন পড়তে পারার শক্তি না থাকলে এমন চিন্তা তার মাঝে কখনোই আসত না। ওই সময়ে মানুষ দ্রুতগামী ঘোড়া অথবা মোটর গাড়ি চাক বা না চাক, তাদের আসল ইরাদা ছিল আরো কম সময়ের মধ্যে কীভাবে গন্তব্যে পৌঁছানো যায়। হেনরি ফোর্ড ওই জিনিসটাই ধরতে পেরেছিলেন। যারা নিজের যুক্তিবুদ্ধির বাইরে অন্য কিছু শুনতে নারাজ, তাদের দিয়ে এসব হয় না।

মানুষের অহং মানুষকে একদিকে ভাবায় সে-ই সব। কিন্তু ভেতরে ভেতরে দেখায় তার হীনম্মন্যতা।

কমজোর লোকেরা একটা কাজ পুরোপুরি ঠিকঠাক হবার আগে মানুষের সামনে আনার সাহস পায় না। এরা অন্যদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ইজাযত দিতে পারে না। কারো ওপর ভরসা করতে পারে না কোনো কাজ দিয়ে। সমালোচনা তো একবিন্দুও

নিতে পারে না। সমালোচনা খুব গায়ে লাগে তাদের। দুনিয়া-বদলানো চিন্তায় এরা আসলে কখনোই পুরোপুরি ঝাঁপাতে পারে না। নিজেদের উচ্চাশা পূরণেরও যথেষ্ট সাহস নেই এদের।

হীনম্মন্য লোকদের আরেকটা সমস্যা আছে। এরা অন্যদের সবসময় ছোট করে দেখে। নিজে না পারলে আরেকজনকেও পারতে দেবে না—যে করেই হোক। এরা যেন অন্যের পায়ে পাথর বেঁধে তাকে গভীর পানিতে ডুবিয়ে দেয় কিংবা সাঁতারুর পা টেনে ধরে যেন সে পানি থেকে উঠতে না পারে।

আমার খালা একদিন মজা করে বলেছিলেন, 'নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করা নিয়ে কোনো খেলা থাকলে পাকিস্তান নিশ্চিত অলিম্পিকে সোনা জিতত!'

শুধু পাকিস্তানে না অবশ্য, মানুষের এই স্বভাব আছে সবখানে। একেক জায়গায় একেক রূপে প্রকাশ পায় আর কী।

হীনম্মন্য লোকেরা কখনো বন্দর ছেড়ে রওনাই হতে পারে না। আর হলেও বেশি দূর যেতে পারে না। গন্তব্যে পৌঁছানো তো অনেক দূর কি বাত।

মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ আমাদের হামবড়া খাসলত আর হীনম্মন্যতা থেকে বাঁচার তাওফিক দান করুন। আমিন।